অধ্যায় : ৩

পরিচ্ছেদ ১ : ধ্বনি ও বর্ণ

ধ্বনিবিজ্ঞান

উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রয়োগ– একটি বিশদ গবেষণামূলক পর্যালোচনা

ভূমিকা ও পটভূমি: ভাষা মান্ষের সবচেয়ে জটিল ও বিস্ময়কর সামর্থগুলোর একটি। প্রতিদিনের প্রতিটি কথোপকথনে আমরা অজস্র ধ্বনির সমষ্টি উৎপাদন ও গ্রহণ করি, অথচ এর অন্তর্নিহিত শারীরতাত্ত্বিক, ভৌত এবং স্নায়বিক জটিলতার কথা আমাদের মনে আসে না। এই ধ্বনিগুলোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করার শাখাটির নাম ধ্বনিবিজ্ঞান (ইংরেজি: Phonetics, গ্রিক: φωνή– ফোনে, অথাৎ 'শব্দ' বা 'ধ্বনি')। এটি ভাষাবিজ্ঞানের সেই মৌলিক শাখা যেখানে মানুষের উচ্চারিত ধ্বনিসমূহের উৎপাদন, তরঙ্গাধমী বিস্তার এবং শবণ-অনুধাবনের সমগ পক্রিয়াটি বিশেষিত হয়।

ধ্বনিবিজ্ঞানকে প্রায়ই ধ্বনিতত্ত্বের (Phonology) সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়, কিন্তু দুটি শাখার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ধ্বনিবিজ্ঞান ধ্বনির ভৌত ও জৈবিক বিষয়ে আলোচনা করে। যেমন– ঠোঁট ঠিক কতটুকু গোল হয়, জিহ্বা তালুর ঠিক কোথায় স্পর্শ করে, শব্দতরঙ্গের কম্পাঙ্ক কত ইত্যাদি। অন্যদিকে ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনা করে কোন ধ্বনি-পার্থক্য একটি ভাষায় অর্থগতভাবে প্রাসঙ্গিক। সংক্ষেপে, ধ্বনিবিজ্ঞান হলো ধ্বনির বিজ্ঞান, আর ধ্বনিতত্ত্ব হলো ভাষায় ধ্বনির কার্যকারিতার বিজ্ঞান।

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ

১. প্রাচীন ভারতীয় উদ্ভাবন: ধ্বনিবিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে সবার আগে ফিরে যেতে হয় প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে, সম্ভবত আরও আগে ষষ্ঠ শতাব্দীতেও, মহর্ষি পাণিনি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করতে গিয়ে ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের স্থান ও পদ্ধতি নিয়ে এমন এক পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন, যা আজকের মানদণ্ডেও অত্যন্ত আধুনিক।

পাণিনির এই শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী ব্যঞ্জনবর্ণগুলো উচ্চারণের স্থানভেদে– কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য ও ওষ্ঠ্য– এই পাঁচটি বর্গে বিভক্ত, যা আজও ভারতীয় লিপিগুলোতে বর্ণসজ্জার মূল ভিত্তি।

এটি লক্ষণীয় যে, পাণিনির শ্রেণিবিভাগ নিছক দার্শনিক অনুমানের ফল ছিল না– এটি ছিল পর্যবেক্ষণভিত্তিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। আধুনিক উচ্চারণগত ধ্বনিবিজ্ঞান যে উচ্চারণ–স্থান ও উচ্চারণ-পদ্ধতির কাঠামো ব্যবহার করে, তার সাথে পাণিনির চিন্তার বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে।

২. মুহম্মদ আবদুল হাই, ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, বর্ণমিছিল, নভেম্বর, ১৯৭৫

২. আঠারো ও উনিশ শতকের ইউরোপীয় উদ্যোগ: ইউরোপে পদ্ধতিগত ধ্বনিবিজ্ঞানচর্চার সূচনা হয় আঠারো শতকের শেষ ভাগে। ১৭৭৯ সালে জোশুয়া স্টিল তাঁর Prosodia Rationalis গ্রন্থে ইংরেজি ভাষার কথার সুর ও ছন্দকে সংকেতায়িত করার প্রথম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এর প্রায় নব্বই বছর পর, ১৮৬৭ সালে, আলেকজান্ডার মেলভিল বেল প্রকাশ করেন তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ Visible Speech, যেখানে বাগযন্ত্রের অঙ্গসংস্থানিক অবস্থান চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

বেলের দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল মৌলিকভাবে দৃশ্যমান করে তোলার একটি প্রচেষ্টা– কীভাবে বায়ু, জিহ্বা, দাঁত ও ঠোঁটের সমন্বয়ে প্রতিটি ধ্বনি তৈরি হয়, তা একটি সর্বজনীন চিহ্ন-পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা। এই স্বপ্নই পরবর্তী প্রজন্মের ধ্বনিবিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করে ১৮৮৮ সালে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি বর্ণমালা বা আইপিএ (IPA) তৈরিতে।

৩. ফোনোগ্রাফ ও ধ্বনিবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত: উনিশ শতকের শেষ দশকে থমাস আলভা এডিসনের ফোনোগ্রাফ আবিষ্কার ধ্বনিবিজ্ঞানের জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। প্রথমবারের মতো মানবকণ্ঠের ধ্বনিকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা ও বারবার বিশ্লেষণ করা সম্ভব হলো। এর আগে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা শুধু নিজের বা অন্যের তাৎক্ষণিক উচ্চারণের ওপর নির্ভর করতেন, যা পর্যবেক্ষণকে সীমিত করে রাখত।

জার্মান ফিজিওলজিস্ট লুডিমার হারম্যান এডিসনের ফোনোগ্রাফ ব্যবহার করে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিশেষ ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে গভীর গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনিই প্রথম ফোনোগ্রাফিক রেকর্ডিং থেকে ধ্বনির ফর্ম্যান্ট কাঠামো শনাক্ত করেন এবং কাগজে

রেকর্ড করা প্রথম শব্দগত উপস্থাপনা তৈরি করেন। হারম্যান উইলিস ও হুইটস্টোনের স্বরবর্ণ উৎপাদন তত্ত্বগুলোকে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন, যা পরীক্ষামূলক ধ্বনিবিজ্ঞানের (Experimental Phonetics) সূচনার মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

ধ্বনিবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান শাখা

আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত, কিন্তু স্বতন্ত্র শাখায় বিভক্ত। প্রতিটি শাখা মানব কণ্ঠধ্বনির একটি ভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে– উৎপাদন, সঞ্চালন এবং গ্রহণ। একটি ধ্বনি উৎপাদন থেকে অনুধাবন পর্যন্ত যে যাত্রা সম্পন্ন করে, তার তিনটি ধাপই এই তিনটি শাখার আলোচ্য বিষয়।

ক. উচ্চারণগত ধ্বনিবিজ্ঞান (Articulatory Phonetics): এই শাখায় বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করেন: একটি নির্দিষ্ট ধ্বনি উৎপন্ন করার সময় বাগযন্ত্রের (vocal tract) বিভিন্ন অংশ– ঠোঁট, দাঁত, দন্তমূল, তালু, জিহ্বার ডগা, পৃষ্ঠ ও মূল, আলজিভ, কণ্ঠনালি (glottis) কোন অবস্থানে থাকে এবং কীভাবে সঞ্চালিত হয়। বায়ু ফুসফুস থেকে কণ্ঠনালি পেরিয়ে মুখ বা নাক দিয়ে বের হওয়ার পথে যে বাধা বা সংকোচন তৈরি হয়, তার প্রকৃতি অনুযায়ীই প্রতিটি ধ্বনি নিজস্ব চরিত্র পায়। যেমন– বাংলায় ‘ক’ উচ্চারণে জিহ্বার পেছন অংশ নরম তালুকে (velum) স্পর্শ করে এবং বায়ুপ্রবাহ সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়, তারপর হঠাৎ উন্মোচিত হয়– এটি একটি কণ্ঠ্য স্পর্শ ব্যঞ্জন (velar stop)। অন্যদিকে ‘স’ উচ্চারণে জিহ্বার সামনের অংশ দন্তমূলের কাছাকাছি এসে একটি সংকীর্ণ পথ তৈরি করে, যে পথ দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হলে ঘর্ষণজনিত শব্দ হয়– এটি একটি ঘর্ষণ ব্যঞ্জন (fricative)।

খ. ধ্বনিতরঙ্গগত বা শাব্দিক ধ্বনিবিজ্ঞান (Acoustic Phonetics): বাগ্যন্ত্র একটি ধ্বনি উৎপন্ন করার পর সেই ধ্বনি বায়ু-মাধ্যমে তরঙ্গ হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। শাব্দিক ধ্বনিবিজ্ঞান এই তরঙ্গের ভৌত বৈশিষ্ট্য– কম্পাঙ্ক (frequency), তীব্রতা (amplitude), সময়কাল (duration) এবং বর্ণালি কাঠামো (spectral structure) বিশ্লেষণ করে।

আধুনিক শাব্দিক ধ্বনিবিজ্ঞানে স্পেকট্রোগ্রাফ একটি অপরিহার্য যন্ত্র। এটি সময়ের সাথে ধ্বনির কম্পাঙ্ক ও শক্তির বণ্টন দৃশ্যমান করে– যাকে বলে স্পেকট্রোগ্রাম। এই চিত্র থেকে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা ফর্ম্যান্ট (স্বরবর্ণের বৈশিষ্ট্য-নির্ধারক শব্দকম্পাঙ্ক), ট্রানজিশন ও শব্দের গতিশীল পরিবর্তন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য আহরণ করতে পারেন।

গ. শ্রুতিগত ধ্বনিবিজ্ঞান (Auditory Phonetics): ধ্বনি উৎপন্ন হয়ে শ্রোতার কানে পৌঁছানোর পর কীভাবে তা অনুধাবন করা হয়– এটি শ্রুতিগত ধ্বনিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। বাইরের কান তরঙ্গ সংগ্রহ করে, মধ্যকর্ণ তা যান্ত্রিক কম্পনে রূপান্তরিত করে, অন্তঃকর্ণের ককলিয়া তা স্নায়বিক সংকেতে পরিণত করে এবং শ্রবণ-মস্তিষ্ক সেই সংকেত ব্যাখ্যা করে ভাষিক অর্থ নির্ধারণ করে।

এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় বক্তব্য অনুধাবন (speech perception)। শ্রুতিগত ধ্বনিবিজ্ঞানীরা জানতে চান: একই রকম শব্দতরঙ্গকে মস্তিষ্ক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে কি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে? কেন কোনো ভাষার মাতৃভাষাভাষী একটি বিদেশি ভাষার নিদিষ্ট ধ্বনি শুনতে ও উচ্চারণ করতে অসুবিধা অনুভব করেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার পথেই নিউরোফিজিওলজি, মনোবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিজ্ঞান পরস্পরের সাথে মিলিত হয়।

ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বের সম্পর্ক: সীমারেখা ও সমন্বয়

ধ্বনিবিজ্ঞান এবং ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্কটি জটিল এবং বহুস্তরীয়। ধ্বনিবিজ্ঞান দেয় তথ্য। যেমন– কোন ধ্বনি কীভাবে উৎপন্ন হয়, তার তরঙ্গরূপ কেমন, মস্তিষ্ক তা কীভাবে প্রক্রিয়া করে। ধ্বনিতত্ত্ব এই তথ্য ব্যবহার করে ভাষার বিমূর্ত ধ্বনি-ব্যবস্থা নির্মাণ করে– কোন ধ্বনি-পার্থক্য অর্থপূর্ণ, কীভাবে ধ্বনিগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত।

যেমন– ইংরেজিতে p-এর দুটি ভিন্ন উচ্চারণ আছে: 'pin' শব্দে প্রশ্বাসযুক্ত [p^h] এবং 'spin' শব্দে প্রশ্বাসহীন [p]। এই দুটি ভিন্ন ধ্বনিগত বাস্তবতা (ধ্বনিবিজ্ঞানের বিষয়) কিন্তু ইংরেজিতে একই ধ্বনিমূলের দুটি অ্যালোফোন (ধ্বনিতত্ত্বের বিষয়), কারণ এই পার্থক্য ইংরেজিতে কখনো দুটি ভিন্ন শব্দ তৈরি করে না। বাংলায় কিন্তু মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের পার্থক্য অর্থপ্রভেদক– ‘কাল’ ও ‘খাল’ দুটি আলাদা শব্দ।

এই দৃষ্টান্তটি ব্যাখ্যা করে– কেন ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব উভয়ই প্রয়োজন, একটি ছাড়া অন্যটি সম্পূর্ণ নয়। (ধ্বনিবিজ্ঞান ছাড়া ধ্বনিতত্ত্ব বিমূর্ত সত্তা নিয়ে কাজ করত– ধ্বনিতত্ত্ব ছাড়া ধ্বনিবিজ্ঞান ভাষিক প্রাসঙ্গিকতা হারাত।)

ধ্বনিলিপি ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি বর্ণমালা (IPA):

ধ্বনিবিজ্ঞানের একটি মূল চ্যালেঞ্জ হলো– বিশ্বের যে-কোনো ভাষার যে-কোনো ধ্বনিকে একটি সর্বজনীন ও দ্ব্যর্থহীন লিখিত রূপ দেওয়া। প্রচলিত বর্ণমালাগুলো এই কাজের জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ এক বর্ণ বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন উচ্চারণ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

এই সমস্যার সমাধান হিসেবে ১৮৮৮ সালে আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান সমিতি (International Phonetic Association) প্রতিষ্ঠা করে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি বর্ণমালা বা IPA। এটি বিশ্বের প্রতিটি মানব ভাষায় যে ধ্বনি বিদ্যমান তার জন্য একটি করে স্বতন্ত্র প্রতীক নির্ধারণ করে। বর্তমানে IPA-তে ১৬০টিরও বেশি মূল প্রতীক রয়েছে।

IPA-এর কার্যকারিতা ভাষাবিজ্ঞানের বাইরেও বিস্তৃত। এটি ব্যবহৃত হয় পেশাদার গায়ক ও অভিনেতাদের উচ্চারণ প্রশিক্ষণে, বাগযন্ত্রের ত্রুটি নিরাময়ে (speech therapy), ভাষাশিক্ষায়, অভিধানে উচ্চারণ-নির্দেশে এবং কম্পিউটার কণ্ঠ-সংশ্লেষণ ব্যবস্থায়।

ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রায়োগিক ক্ষেত্র

১. ফরেনসিক ধ্বনিবিজ্ঞান: ফরেনসিক ধ্বনিবিজ্ঞান হলো ধ্বনিবিজ্ঞানের বিধি ও পদ্ধতি আইনি উদ্দেশে প্রয়োগের শাখা। অপরাধ তদন্তে রেকর্ডকৃত কণ্ঠস্বর বিশ্লেষণ করে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করা, টেলিফোনিক হুমকির ভাষাগত উৎস নির্ধারণ করা, বা কোনো বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা– এসব কাজে ফরেনসিক ধ্বনিবিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা স্পেকট্রোগ্রামিক বিশ্লেষণ, ভয়েসপ্রিন্ট তুলনা ও পিচ-ট্র্যাকিং পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

২. বাক্-প্রযুক্তি: স্বীকৃতি ও সংশ্লেষণ: আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তিতে ধ্বনিবিজ্ঞানের সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রয়োগ হলো বাক্-প্রযুক্তিতে। বাক্-স্বীকৃতি (Speech Recognition) পদ্ধতিতে একটি কম্পিউটার ব্যবস্থা মানব কণ্ঠের ধ্বনি বিশ্লেষণ করে তাকে লিখিত পাঠে রূপান্তরিত করে, যেমন– Siri, Google Assistant বা Alexa। আবার বাক্-সংশ্লেষণ (Speech synthesis) পদ্ধতিতে কম্পিউটার নিজে মানবিক কণ্ঠস্বর তৈরি করে, যা টেক্সট-টু-স্পিচ প্রযুক্তিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত।

উভয় ক্ষেত্রেই ধ্বনিবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য– কারণ কম্পিউটারকে বুঝতে হবে একটি ধ্বনি তরঙ্গের কোন বৈশিষ্ট্যগুলো কোন ধ্বনিমূলের সাথে সংগত এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩. সামাজিক ধ্বনিবিজ্ঞান ও পরিচয় প্রকাশ: সাম্প্রতিক গবেষণা দেখিয়েছে যে, ধ্বনি উচ্চারণ কেবল জৈবিক বা ভৌগোলিক নয়, তা সামাজিক পরিচয়েরও প্রকাশ। একজন বক্তার লিঙ্গ, বয়স, সামাজিক শ্রেণি, জাতিগত পরিচয় ও আঞ্চলিক পটভূমি তাঁর উচ্চারণে প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাভেদে– সিলেটি, চট্টগ্রামী, রাজশাহীর ভাষা– ধ্বনিগত পার্থক্যগুলো এই সামাজিক ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৪. ভাষাশিক্ষা ও উচ্চারণ প্রশিক্ষণ: দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে ধ্বনিবিজ্ঞান একটি অপরিহার্য ভূমিকা রাখে। কেন বাংলাভাষীরা ইংরেজিতে 'th' উচ্চারণ করতে কষ্ট পান? কেন জাপানিভাষীরা 'ষ' ও '৫'-এর পার্থক্য ধরতে পারেন না? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ধ্বনিবিজ্ঞানে আছে– কারণ মানুষের মস্তিষ্ক তার মাতৃভাষার ধ্বনি-ব্যবস্থা দিয়ে নতুন ভাষার ধ্বনি অনুধাবন করার চেষ্টা করে।

প্রায়োগিক ধ্বনিবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ

ধ্বনিবিজ্ঞান অধ্যয়ন কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণের বিষয় নয়– এর একটি শক্তিশালী প্রায়োগিক মাত্রা রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রবণ প্রশিক্ষণ (Ear training) সম্পন্ন করতে হয়, যেখানে তারা ক্রমশ সূক্ষ্ম ধ্বনি-পার্থক্য শনাক্ত করতে শেখেন।

এই প্রশিক্ষণের তিনটি মূল উপাদান রয়েছে: **প্রথমত**, বিভিন্ন ভাষার ধ্বনির পরিসর শোনা ও শনাক্ত করা; **দ্বিতীয়ত**, নিজের উচ্চারণের ওপর সচেতন নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা এবং **তৃতীয়ত**, IPA প্রতীক ব্যবহার করে সেই ধ্বনিগুলো সঠিকভাবে প্রতিলিপি করতে সক্ষম হওয়া। এই দক্ষতা অর্জনে মাসের পর মাস নিয়মিত অনুশীলন প্রয়োজন।

ধ্বনিবিজ্ঞান মানব-যোগাযোগের সবচেয়ে মৌলিক স্তর ও ধ্বনির স্তরকে বৈজ্ঞানিক আলোয় উদ্ভাসিত করে। পাণিনির প্রাচীন পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করে আজকের ডিজিটাল বাক্-প্রযুক্তি পর্যন্ত ধ্বনিবিজ্ঞানের যাত্রা শুধু মানব কণ্ঠের বিজ্ঞান নয়– এটি মানবিক বোঝাপড়া ও যোগাযোগের গভীরতম রহস্য উন্মোচনের একটি অন্তহীন অনুসন্ধান।

উচ্চারণগত, শাব্দিক ও শ্রুতিগত– এই তিনটি শাখার সমন্বয়ে ধ্বনিবিজ্ঞান আজ শুধু ভাষাবিজ্ঞান নয়, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কম্পিউটারবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও আইনি বিজ্ঞানের সাথেও গভীরভাবে আন্তঃসংযুক্ত। এই আন্তঃবিভাগীয় প্রকৃতিই ধ্বনিবিজ্ঞানকে একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রাণবন্ত গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ধ্বনিবিজ্ঞানকে তিনটি প্রধান শাখায় ভাগ করা হয়:

১. **উচ্চারণগত ধ্বনিবিজ্ঞান (Articulatory Phonetics):** এই শাখায় ধ্বনি উৎপাদনের সময় ঠোঁট, জিহ্বা, কণ্ঠ ও অন্যান্য বাগ্যন্ত্রের অবস্থান ও কার্যপ্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়।
   এটি মূলত বোঝায়, কোনো নির্দিষ্ট ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমাদের মুখগহ্বর ও শ্বাসতন্ত্র কীভাবে কাজ করে।

২. **ধ্বনিতরঙ্গগত ধ্বনিবিজ্ঞান (Acoustic Phonetics):** ধ্বনির তরঙ্গগত বৈশিষ্ট্য ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করে। এটি ব্যাখ্যা করে কোনো ধ্বনির কম্পন, তীব্রতা, উচ্চতা, শব্দতরঙ্গের বিস্তার এবং সেই ধ্বনি কানে কীভাবে পৌঁছায়।

৩. **শ্রুতিগত ধ্বনিবিজ্ঞান (Auditory Phonetics):** কানের মাধ্যমে ধ্বনি গ্রহণ ও মস্তিষ্কে প্রক্রিয়াকরণের বিশ্লেষণ করে। এটি গবেষণা করে কীভাবে মানুষ ধ্বনি শোনে, ব্যাখ্যা করে এবং তা থেকে ভাষার অর্থ বোঝে।

ধ্বনিবিজ্ঞান অংশের গ্রন্থপঞ্জি ও সহায়ক সূত্র

- *Ladefoged, Peter. A Course in Phonetics. London: Harcourt Brace Jovanovich, 1982.*
- *Ladefoged, Peter & Maddieson, Ian.The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.*
- *Hardcastle, William J. & Laver, John.The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell Publishers, 1997.*
- *O'Gradz, William et al. Contemporary Linguistics: An Introduction (5th ed.). Bedford/St. Martin's, 2005.*
- *Stearns, Peter et al. World Civilizations (3rd ed.). New York: Longman, 2001.*
- *Clark, John & Yallop, Colin. An Introduction to Phonetics and Phonology (2nd ed.). Oxford: Blackwell, 1995.*
- *Stevens, Kenneth N. Acoustic Phonetics. Cambridge, MA: MIT Press, 1998.*
- *Pisoni, David B. & Remez, Robert E.The Handbook of Speech Perception. Oxford: Blackwell Publishers, 2004.*

ধ্বনি পরিবর্তন

প্রতিদিন মানুষ যখন কথা বলে তখন আসলে সে কতকগুলো ধ্বনি উচ্চারণ করে। এই অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি হলো ভাষা। ভাষারও পরিবর্তন ঘটে থাকে। ভাষার পরিবর্তন বলতে ধ্বনির পরিবর্তনকে বোঝায়। ভাষার ধ্বনিগুলো নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। একটি ধ্বনির প্রভাবে আরেকটি ধ্বনি পরিবর্তিত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দুই ধ্বনির মাঝামাঝি আরেকটি নতুন ধ্বনি এসে যায়। প্রতিটির উচ্চারণ অবিকল একই রকম হয় না এবং একই ব্যক্তি সবসময় একইভাবে উচ্চারণ করে না। আমরা অনেক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উচ্চারণ করে থাকি। বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণের মূলে শরীরী কারণ থাকতে পারে, থাকতে পারে সামাজিক কারণ। শ্রান্ত–ক্লান্ত থাকলে কিংবা স্বরযন্ত্রের কারণেও অনেক সময় উচ্চারণ অন্য রকম হয়। পরিবেশগত কারণে মানুষের উচ্চারণভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ফলে শিষ্ট ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য তৈরি হয়। বাংলা একটি চলমান জীবন্ত ভাষা, ধ্বনি পরিবর্তনের কারণে এই ভাষারও পরিবর্তন ঘটে থাকে।[১]

ভাষার ক্ষুদ্রতম মৌলিক অংশ ধ্বনি। এ ধ্বনি দ্বারাই ভাষার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। শব্দের উচ্চারণকালে ধ্বনিগুলো সবসময় অপরিবর্তিত বা অবিকৃত থাকে না। উচ্চারণকালে বিভিন্ন কারণে ধ্বনির নানা প্রকার পরিবর্তনকে ধ্বনি পরিবর্তন বলে। ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। ধ্বনি পরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। ভাষা পরিবর্তনের মুখ্য কারণ ধ্বনির পরিবর্তন। ভাষা পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান কারণ উচ্চারণ পদ্ধতি ও ধ্বনির শ্রুতিগত দিকের পরিবর্তন। ভাষা পরিবর্তনের যে বিভিন্ন কারণ, তা পর্যালোচনা করে ভাষা পরিবর্তনের প্রকৃতিকে দু'দিক থেকে নির্দেশ করা যায়। যথা: নিয়মিত ও অনিয়মিত ভাষা পরিবর্তন। যেক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণ সর্বত্র নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করা সম্ভব তাকে নিয়মিত এবং যখন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে ধ্বনির পরিবর্তন হয়, তখন তাকে অনিয়মিত কারণ বলে।

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

নদীর গতিপথ পরিবর্তনের পেছনে যেমন বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা কাজ করে, তেমনি ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও অসংখ্য কারণ বিদ্যমান। যেমন–

১. সাদৃশ্য (analogy) ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের একটি বিশেষ কারণ।
২. আপাত দ্বন্দ্ব ধ্বনি পরিবর্তনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। প্রাচীনত্বের সাথে নতুনত্বের এ সংঘর্ষ থেকে প্রতিনিয়ত ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন হচ্ছে।
৩. ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ ভাষার আয়ত্তকরণ প্রকৃতি। জিহ্বার জড়তা, শ্রবণশক্তির প্রখরতা, শব্দের মধ্যকার ধ্বনিগুলোর পারস্পরিক প্রভাব, ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণ-বিশেষত্ব– এসব ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ হিসেবে স্বীকার্য।
৪. ধ্বনি পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ ভাষার চলন গতি। চলার পথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাধা ও ভাষা ভিন্নতার কারণে ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন হয়েছে।
৫. ধ্বনি পরিবর্তনের সবচেয়ে বড়ো কারণ বিভিন্ন ভাষা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন।
৬. ভৌগোলিক অবস্থানও ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দারুণ প্রভাব ফেলে।

ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম

ভাষাতাত্ত্বিকগণ ধ্বনি পরিবর্তনগুলোকে ধ্বনি পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

(ক) স্বরধ্বনির পরিবর্তন ও

(খ) ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন।

১. তথ্যসূত্র: ড. মো. চেঙ্গীশ খান, বাংলা দ্বিতীয় পত্র, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ২০২২, পৃ.–২৪

(ক) স্বরধ্বনির পরিবর্তন: উচ্চারণকালে যদি শব্দস্থিত স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়, সেগুলোকে স্বরধ্বনির পরিবর্তন বলে। স্বরধ্বনির পরিবর্তনগুলো নিম্নে পর্যায়ক্রমে দেখানো হলো:

১. স্বরাগম: দ্রুত উচ্চারণের কারণে শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত্যে ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে কোনো অতিরিক্ত স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে স্বরাগম বলে। স্বরাগম তিন প্রকার। যথা:

(ক) আদি স্বরাগম: উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন– স্তাবল – আস্তাবল, স্পর্ধা – আস্পর্ধা ইত্যাদি।

(খ) **মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি:** উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলা হয় মধ্য স্বরাগম। যেমন– রত্ন – রতন, ধর্ম – ধরম, স্বপ্ন – স্বপন ইত্যাদি।

(গ) **অন্ত্য স্বরাগম:** কোনো কোনো সময় উচ্চারণকালে শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে। একে অন্ত্য স্বরাগম বলে। যেমন– দিশ্ – দিশা, বেঞ্চ – বেঞ্চি, আজ – আজি ইত্যাদি।

২. **সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ:** দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন– বসতি – বস্তি, জানালা – জান্‌লা ইত্যাদি।

স্বলোপ মূলত স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া। স্বরলোপ বা সম্প্রকর্ষ তিন প্রকার। যথা:

(ক) **আদি স্বরলোপ:** উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদি থেকে স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে আদি স্বরলোপ বলে। যেমন– অলাবু $\rightarrow$ লাবু $\rightarrow$ লাউ, উদ্ধার $\rightarrow$ উধার $\rightarrow$ ধার ইত্যাদি।

(খ) **মধ্য স্বরলোপ:** সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মাঝখান থেকে স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে মধ্য স্বরলোপ বলে। যেমন– অগুরু – অগ্রু, সুবর্ণ – স্বর্ণ।

(গ) **অন্ত্য স্বরলোপ:** কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনির লোপ হয়। একে বলা হয় অন্ত্য স্বরলোপ। যেমন– আশা – আশ, আজি – আজ, চারি – চার, সন্ধ্যা – সঞ্ঝা – সাঁঝ ইত্যাদি।

৩. **অপিনিহিতি:** অপি অর্থ পূর্বে এবং নিহিতি শব্দের অর্থ সন্নিবেশ। অর্থাৎ, শব্দের পরের ই-কার বা উ-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে, তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন– বাক্য – বাইক্য, সত্য – সইত্য, সাধু – সাউধ, আজি – আইজ ইত্যাদি।

৪. **অসমীকরণ:** একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য শব্দের মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি 'আ' যুক্ত হয়, তখন তাকে অসমীকরণ বলে। অসমীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া সমীভবন বা সমীকরণ। যেমন– পট + পট – পটাপট, টপ + টপ – টপাটপ, ধপ + ধপ – ধপাধপ, গপ + গপ – গপাগপ ইত্যাদি।

৫. **স্বরসংগতি:** একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসংগতি বলে। যেমন– দেশি – দিশি, মুলা – মুলো ইত্যাদি। স্বরসংগতি পাঁচ প্রকার। যথা:

(ক) **প্রগত স্বরসংগতি:** আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে, তাকে প্রগত স্বরসংগতি বলে। যেমন– তুলা – তুলো, শিকা – শিকে, মুলা – মুলো ইত্যাদি।

(খ) **পরাগত স্বরসংগতি:** অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে, তাকে পরাগত স্বরসংগতি বলে। যেমন– দেশি – দিশি।

(গ) **মধ্যগত স্বরসংগতি:** আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর কিংবা অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে, তাকে মধ্যগত স্বরসংগতি বলে। যেমন– জিলাপি – জিলিপি, বিলাতি – বিলিতি ইত্যাদি।

(ঘ) **অন্যোন্য:** আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যোন্য স্বরসংগতি হয়। যেমন– মোজা – মুজো, ভোলা – ভুলো ইত্যাদি।

(ঙ) **চলিত বাংলায় স্বরসংগতি:** গিলা – গেলা, মিলামিশা – মেলামেশা ইত্যাদি। পূর্বস্বর উ-কার হলে পরবর্তী স্বর আ-কার হয় না ও-কার হয়। যেমন– মুড়া – মুড়ো, চুলা – চুলো ইত্যাদি। বিশেষ নিয়মে উড়নি – উড়নি, এখনি – এখুনি ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: মুনীর চৌধুরী, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০২৯, পৃ. ২৮

৬. **অভিশ্রুতি:** বিপর্যস্ত স্বরর্ধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং সেই অনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিশ্রুতি। অন্য কথায়, অপিনিহিতি জাত ই-কার বা উ-কার উচ্চারণকালে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে এক অভ্যন্তর সন্ধিতে মিলিত হয়ে এ-কার বা ও-কারে পরিবর্তিত হয়, স্বরধ্বনির এই পরিবর্তনকে ভাষাবিজ্ঞানে অভিশ্রুতি বলা হয়। যেমন– করিয়া থেকে অপিনিহিতির ফলে 'কইরিয়া' কিংবা বিপর্যয়ের ফলে 'কইরা' থেকে অভিশ্রুতিজাত 'করে' হয়। সাধারণত তিনটি নিয়মে এই পরিবর্তন ঘটে–

	প্রদত্ত শব্দ	অপিনিহিতি বা ধ্বনিবিপর্যয়	অভিশ্রুতি
১.	অ + ই – ও	চলিতে – চইলতে	– চোলতে
	করিয়া –	কইর্যা – ক'র্যা	– ক'রে – কোরে

২.	আ + ই –	আজি – আইজ	– আজ
		কালি – কাইল	– কাল
৩.	বিবিধ:	আসিয়া – আইসা	– এসে
		রাখিয়া – রাইখ্যা	– রেখা – রেখে
		ছালিয়া – ছাইলা	– ছেলে

[দ্রষ্টব্য: অভিশ্রুতির সাথে অপিনিহিতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।]

(খ) ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন: উচ্চারণকালে যেসব কারণে ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত হয়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন বলে। নিম্নে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন প্রক্রিয়া উদাহরণ ও সংজ্ঞার্থসহ আলোচনা করা হলো:

১. **ধ্বনি বিপর্যয়:** শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন বা একই শব্দে অবস্থিত বর্ণের পরস্পর স্থান পরিবর্তনকে ধ্বনি বিপর্যয় বা বর্ণ বিপর্যয় বা বিপর্যাস বলে। তৎসম ও বিদেশি শব্দে এর প্রয়োগ বেশি ঘটে। যেমন– বাক্স – বাস্ক, রিকশা– রিস্কা, পিশাচ– পিচাশ, লাফ– ফাল ইত্যাদি।

২. **সমীভবন:** শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তর সমতা লাভ করে। এ বিষয়টিকে বলা হয় সমীভবন। যেমন– জন্ম– জম্ম, কাঁদনা– কান্না, ধর্ম– ধম্ম ইত্যাদি।

   সমীভবনের অপর নাম সমীকরণ এবং সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া হচ্ছে অসমীকরণ। সমীভবন তিন প্রকার। যথা:

   (ক) **প্রগত সমীভবন:** যদি পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ, পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, তখন তাকে বলে প্রগত সমীভবন। যেমন– চক্র– চক্‌ক, পক্ব– পক্ক, পদ্ম– পদ্দ, লগ্ন– লগ্‌গ ইত্যাদি।

   (খ) **পরাগত সমীভবন:** যদি পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, তখন তাকে পরাগত সমীভবন বলে। প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি পরাগত সমীভবনের নিয়মে হয়ে থাকে। যেমন– তৎ + জন্য = তজ্জন্য, তৎ + হিত = তদ্ধিত, উৎ + মুখ = উন্মুখ, উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল ইত্যাদি।

   (গ) **অন্যোন্য সমীভবন:** যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটি ধ্বনিই পরিবর্তিত হয়, তখন তাকে বলে অন্যোন্য সমীভবন। যেমন– সংস্কৃত সত্য – প্রাকৃত সচ্চ, সংস্কৃত বিদ্যা – প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি।

৩. **বিষমীভবন:** দুটি সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন– শরীর– শরীল, লাল– নাল, লালু– নালু ইত্যাদি।

৪. **দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বা:** কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বা। যেমন– পাকা– পাক্কা, সকাল– সক্কাল, চাকা– চাক্কা ইত্যাদি।

৫. **ব্যঞ্জন বিকৃতি:** শব্দমধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। যেমন– কবাট– কপাট, ধোবা– ধোপা, ধাইমা– দাইমা ইত্যাদি। একই বর্গীয় ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জন বিকৃতি ঘটে।

৬. **ব্যঞ্জনচ্যুতি বা ধ্বনিচ্যুতি**: পাশাপাশি সম-উচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি। যেমন– বউদিদি– বউদি, বড়ো দাদা– বড়দা ইত্যাদি।

৭. **অন্তর্হতি:** পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন– ফাল্‌গুন– ফাগুন, ফলাহার– ফলার, আলাহিদা– আলাদা ইত্যাদি।

৮. **র-কার লোপ:** আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন– তর্ক– তক্ক, করতে– কত্তে, মারল– মাল্ল, করলাম– কল্লাম ইত্যাদি।

৯. **হ-কার লোপ:** আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়। যেমন– পুরোহিত– পুরুত, গাহিল– গাইল, চাহে– চায় ইত্যাদি।

১০. **য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি:** শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটি স্বর মিলে একটি দ্বি-স্বর যৌগিক স্বর না হয়, তবে এ স্বর দুটির মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তস্থ 'য়' (ণ) বা অন্তস্থ 'ব' (ড) উচ্চারিত হয়। যেমন– যা

+ আ = যা (ও) য়া = যাওয়া; মা + আমার = মা (য়) আমার = মায়ামার; না + আ = না (ও) য়া = নাওয়া; খা + আ = খা (ও) য়া = খাওয়া।

পরিচ্ছেদ ৩ : বাংলা বানানের নিয়ম

৫. ক্রিয়া পদের রূপ

৫.১. 'উঠ্' ধাতুর রূপ: বিভিন্ন পুরুষ ও কালের পরিবর্তনে 'উঠ্' ধাতুর রূপ:

ব্যক্তি/পুরুষ	অতীত (অনিয়মিত)	অতীত (নিয়মিত)	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
আমি	উঠতাম, উঠেছিলাম	উঠলাম, উঠেছি	উঠছি, উঠি	উঠব
তুমি	উঠতে, উঠেছিলে	উঠলে, উঠেছ	উঠছ, ওঠো	উঠবে
তুই	উঠতি, উঠেছিলি	উঠলি, উঠেছিস	উঠছিস, উঠিস	উঠবি
সে	উঠত, উঠেছিল	উঠল, উঠেছে	উঠছে, ওঠে	উঠবে
আপনি/তিনি	উঠতেন, উঠেছিলেন	উঠলেন, উঠেছেন	উঠছেন, ওঠেন	উঠবেন

'উঠ্' থেকে 'ওঠা' বানানো হলে:

অতীত	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
ওঠাতাম, উঠিয়েছিলাম	ওঠাচ্ছি, ওঠাই	ওঠাব
ওঠাতে, উঠিয়েছিলে	ওঠাচ্ছ, ওঠাও	ওঠাবে
ওঠাত, উঠিয়েছিল	ওঠাচ্ছে, ওঠায়	ওঠাক

৫.২. 'কর্ ধাতুর রূপ: বিভিন্ন পুরুষ ও কালের পরিবর্তনে 'কর্ ধাতুর রূপ:

ব্যক্তি/পুরুষ	অতীত (অনিয়মিত)	অতীত (নিয়মিত)	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
আমি	করতাম, করেছিলাম	করলাম, করেছি	করছি, করি	করব
তুমি	করতে, করেছিলে	করলে, করেছ	করছ, করো	করবে
তুই	করতি, করেছিলি	করলি, করেছিস	করছিস, করিস	করবি
সে	করত, করেছিল	করল, করেছে	করছে, করে	করবে
আপনি/তিনি	করতেন, করেছিলেন	করলেন, করেছেন	করছেন, করেন	করবেন

'ক' থেকে 'করানো' বানানো হলে:

অতীত	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
করাতাম, করিয়েছিলাম	করাচ্ছি, করাই	করাব
করাতে, করিয়েছিলে	করাচ্ছ, করাও	করাবে
করাত, করিয়েছিল	করাচ্ছে, করায়	করাক

৫.৩. 'কাট্' ধাতুর রূপ: বিভিন্ন পুরুষ ও কালের পরিবর্তনে 'কাট্' ধাতুর রূপ:

ব্যক্তি/পুরুষ	অতীত (অনিয়মিত)	অতীত (নিয়মিত)	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
আমি	কাটতাম, কেটেছিলাম	কাটলাম, কেটেছি	কাটছি, কাটি	কাটব
তুমি	কাটতে, কেটেছিলে	কাটলে, কেটেছ	কাটছ, কাটো	কাটবে
তুই	কাটতি, কেটেছিলি	কাটলি, কেটেছিস	কাটছিস, কাটিস	কাটবি
সে	কাটত, কেটেছিল	কাটল, কেটেছে	কাটছে, কাটে	কাটবে

ব্যক্তি/পুরুষ	অতীত (অনিয়মিত)	অতীত (নিয়মিত)	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
আপনি/তিনি	কাটতেন, কেটেছিলেন	কাটলেন, কেটেছেন	কাটছেন, কাটেন	কাটবেন

'কাট্' থেকে 'কাটানো' বানানো হলে:

অতাত	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
কাটাতাম, কাটিয়েছিলাম	কাটাচ্ছি, কাটাই	কাটাব
কাটাতে, কাটিয়েছিলে	কাটাচ্ছ, কাটাও	কাটাবে
কাটাত, কাটিয়েছিল	কাটাচ্ছে, কাটায়	কাটাক

ক্রিয়া পদের রূপ ও ব্যবহার

বাংলা ভাষায় ক্রিয়া পদের সঠিক রূপ জানা খুবই জরুরি। প্রতিটি ধাতুর (মূল ক্রিয়ার) বিভিন্ন কালে ও পুরুষে (ব্যক্তি) পরিবর্তিত রূপ আছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধাতুর রূপভেদ সহজ ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হলো।

৫.৪. 'খা' ধাতুর রূপ

ব্যক্তি/পুরুষ	অতীত (অনিয়মিত)	অতীত (নিয়মিত)	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
আমি	খেতাম, খেয়েছিলাম	খেলাম, খেয়েছি	খাচ্ছি, খাই	খাব
তুমি	খেতে, খেয়েছিলে	খেলে, খেয়েছ	খাচ্ছ, খাও	খেয়ো, খাবে
তুই	খেতিস, খেয়েছিলি	খেলি, খেয়েছিস	খাচ্ছিস, খাস	খাবি, খা
সে	খেতো, খেয়েছিল	খেলো, খেয়েছে	খাচ্ছে, খায়	খাক, খাবে
আপনি/তিনি	খেতেন, খেয়েছিলেন	খেলেন, খেয়েছেন	খাচ্ছেন, খান	খাক, খাবেন

'খাওয়ানো' ধাতুর রূপ: খাওয়াতাম, খাইয়েছিলাম, খাওয়াচ্ছিলাম, খাওয়ালাম, খাইয়েছি, খাওয়াচ্ছি, খাওয়াই, খাওয়াব।

৫.৫. 'দি' ধাতুর রূপ

ব্যক্তি/পুরুষ	অতীত (অনিয়মিত)	অতীত (নিয়মিত)	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
আমি	দিতাম, দিয়েছিলাম	দিলাম, দিয়েছি	দিচ্ছি, দিই	দেব
তুমি	দিতে, দিয়েছিলে	দিলে, দিয়েছ	দিচ্ছ, দাও	দিয়ো, দেবে
তুই	দিতিস, দিয়েছিলি	দিলি, দিয়েছিস	দিচ্ছিস, দিস	দিবি, দে
সে	দিত, দিয়েছিল	দিলো, দিয়েছে	দিচ্ছে, দেয়	দিক, দেবে
আপনি/তিনি	দিতেন, দিয়েছিলেন	দিলেন, দিয়েছেন	দিচ্ছেন, দেন	দিন, দেবেন

'দেওয়ানো' ধাতুর রূপ: দেওয়াতাম, দিইয়েছিলাম, দেওয়াচ্ছিলাম, দেওয়ালাম, দিইয়েছি, দেওয়াচ্ছি, দেওয়াই, দেওয়াব।

৫.৬. 'দৌড়া' ধাতুর রূপ

ব্যক্তি/পুরুষ	অতীত	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
আমি	দৌড়াতাম, দৌড়েছিলাম	দৌড়াচ্ছি, দৌড়াই	দৌড়াব
তুমি	দৌড়াতে, দৌড়েছিলে	দৌড়াচ্ছ, দৌড়াও	দৌড়াবে
তুই	দৌড়াতিস, দৌড়েছিলি	দৌড়াচ্ছিস, দৌড়াস	দৌড়াবি, দৌড়া
সে	দৌড়াত, দৌড়েছিল	দৌড়াচ্ছে, দৌড়ায়	দৌড়াক, দৌড়াবে
আপনি/তিনি	দৌড়াতেন, দৌড়েছিলেন	দৌড়াচ্ছেন, দৌড়ান	দৌড়াক, দৌড়াবেন

৫.৭. 'যা' ধাতুর রূপ

ব্যক্তি/পুরুষ	অতীত	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
আমি	যেতাম, গিয়েছিলাম	যাচ্ছি, যাই	যাব
তুমি	যেতে, গিয়েছিলে	যাচ্ছ, যাও	যেয়ো, যাবে
তুই	যেতিস, গিয়েছিলি	যাচ্ছিস, যাস	যাবি, যা
সে	যেত, গিয়েছিল	যাচ্ছে, যায়	যাক, যাবে
আপনি/তিনি	যেতেন, গিয়েছিলেন	যাচ্ছেন, যান	যাক, যাবেন

'যাওয়ানো' ধাতুর রূপ: যাওয়াতাম, যাইয়েছিলাম, যাওয়াচ্ছিলাম, যাওয়ালাম, যাইয়েছি, যাওয়াচ্ছি, যাওয়াই, যাওয়াব।

৫.৮. 'শিখ্' ধাতুর রূপ

ব্যক্তি/পুরুষ	অতীত	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
আমি	শিখতাম, শিখেছিলাম	শিখছি, শিখি	শিখব
তুমি	শিখতে, শিখেছিলে	শিখছ, শেখো	শিখবে
তুই	শিখতিস, শিখেছিলি	শিখছিস, শিখিস	শিখবি, শেখ
সে	শিখত, শিখেছিল	শিখছে, শেখে	শিখুক, শিখবে
আপনি/তিনি	শিখতেন, শিখেছিলেন	শিখছেন, শেখেন	শিখুক, শিখবেন

'শেখানো' ধাতুর রূপ: শেখাতাম, শিখিয়েছিলাম, শেখাচ্ছিলাম, শেখালাম, শিখিয়েছি, শেখাচ্ছি, শেখাই, শেখাব।

৫.৯. 'শু' ধাতুর রূপ

ব্যক্তি/পুরুষ	অতীত	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
আমি	শুতাম, শুয়েছিলাম	শুচ্ছি, শুই	শোব
তুমি	শুতে, শুয়েছিলে	শুচ্ছ, শোও	শোবে
তুই	শুতিস, শুয়েছিলি	শুচ্ছিস, শুস	শুবি, শো
সে	শুতো, শুয়েছিল	শুচ্ছে, শোয়	শুক, শোবে
আপনি/তিনি	শুতেন, শুয়েছিলেন	শুচ্ছেন, শোন	শুক, শোবেন

'শোয়ানো' ধাতুর রূপ: শোয়াতাম, শুইয়েছিলাম, শোয়াচ্ছিলাম, শোয়ালাম, শুইয়েছি, শোয়াচ্ছি, শোয়াই, শোয়াব।

৫.১০. 'হ' ধাতুর রূপ

ব্যক্তি/পুরুষ	অতীত	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
আমি	হতাম, হয়েছিলাম	হচ্ছি, হই	হব
তুমি	হতে, হয়েছিলে	হচ্ছ, হও	হবে
তুই	হতিস, হয়েছিলি	হচ্ছিস, হোস	হবি, হ
সে	হতো, হয়েছিল	হচ্ছে, হয়	হোক, হবে
আপনি/তিনি	হতেন, হয়েছিলেন	হচ্ছেন, হন	হোক, হবেন

'হওয়ানো' ধাতুর রূপ: হওয়াতাম, হইয়েছিলাম, হওয়াচ্ছিলাম, হওয়ালাম, হইয়েছি, হওয়াচ্ছি, হওয়াই, হওয়াব।

এই ধাতুর রূপগুলো ঠিকভাবে প্রয়োগ করলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণগত শুদ্ধতা বজায় থাকবে। ভাষার সঠিক ব্যবহার আমাদের ভাব প্রকাশকে আরও স্পষ্ট ও সুন্দর করবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ব্যবহৃত বানান রীতি

বাংলা ভাষার বানান যেন সর্বত্র একই নিয়মে লেখা হয়, সে লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কিছু নির্দিষ্ট বানান রীতি নির্ধারণ করেছে। এই নিয়মগুলো অনুসরণ করলে বানান নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি থাকবে না এবং লেখার শুদ্ধতা বজায় থাকবে। চলো, সহজ ভাষায় এসব নিয়ম বুঝে নিই।

১. রেফ (´) ও দ্বিত্ব ব্যঞ্জনবর্ণ

রেফের (´) পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না, তা যে-কোনো শব্দেই হোক (তৎসম বা অতৎসম)।

ঠিক: কর্জ, কর্ম, কার্য, পূর্ব, ফর্দ, মর্দ, মর্মর, শর্ত, সূর্য।

ভুল: কর্ম্ম, কার্য্য, সূর্য্য।

২. সন্ধিতে অনুস্বার (ং) ও 'ঙ' ব্যবহারের নিয়ম

তৎসম সন্ধিবন্ধ শব্দে: যদি প্রথম পদের শেষে 'ম' থাকে এবং পরবর্তী শব্দ ক-গোষ্ঠীর (ক, খ, গ, ঘ, ক্ষ) হয়, তাহলে ম → ং (অনুস্বার) হবে।

ঠিক: অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত।

ভুল: অহমকার, ভয়ঙ্কর, সঙ্গীত।

সন্ধিবন্ধ না হলে: ক, খ, গ, ঘ, ক্ষ-এর আগে 'ঙ' ব্যবহৃত হবে।

ঠিক: অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, লঙ্ঘন, শঙ্খ, সঙ্গে।

ভুল: অংক, আকাংক্ষা, লংঘন, শংখ, সংগে।

অতৎসম শব্দে এই বাধ্যবাধকতা নেই। তবে, প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে 'ং' থাকবে।

ঠিক: জং, পালং, রং, শিং, সং।

ভুল: জঙ, পালঙ, রঙ, শিঙ, সঙ।

শব্দের ভেতর বা শেষে স্বরবর্ণ থাকলে 'ং' → 'ঙ' হবে।

ঠিক: বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।

ভুল: বাংগালি, ভাংগা, রংগিন, রংগের।

'বাংলা' ও 'বাংলাদেশ' শব্দ দুটি 'ং' দিয়েই লেখা হবে।

৩. হসচিহ্ন (্) ও ঊর্ধ্বকমা (') বর্জন

হসচিহ্ন ও ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব ব্যবহার করা হবে না।

ঠিক: উচিত, করব, চট, ঝরঝর, চারশ, দুজন।

ভুল: উচিত্, করব্, চ'ট, ঝরঝ, চারশ', দু'জন।

তবে উচ্চারণ বিভ্রান্তি এড়াতে কিছু শব্দে হসচিহ্ন রাখা যেতে পারে। যেমন–

ওয়াক্ফ, চল্, বল্ (অনুজ্ঞা), শেল্ফ, হস্।

৪. স্বরবর্ণের ব্যবহার (ই, ঈ, উ, ঊ)

তৎসম শব্দে 'ই–ঈ' ও 'উ–ঊ' উভয়ই শুদ্ধ হলে, হ্রস্ব রূপ (ই, উ) গ্রহণযোগ্য হবে।

ঠিক: অঞ্জুরি, খঞ্জনি, চিৎকার, জানুয়ারি, নুর, পাখি, পুব, বাড়ি, শুটিং, সরকারি, সূচি।

ভুল: অঞ্জূরী, খঞ্জনী, চীৎকার, জানুয়ারী, নূর, পাখী, পূর্ব, বাড়ী, শূটিং, সরকারী, সূচী।

কিছু স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে 'ঈ' থাকবে।

ঠিক: কিংকরী, পিশাচী, মানবী, হরিণী।

ভুল: কিংকরি, পিশাচি, মানবি, হরিণি।

ভাষা ও জাতির নামের শেষে 'ই' থাকবে।

ঠিক: আরবি, ইংরেজি, জাপানি, ফরাসি, বাঙালি, হিন্দি।

ভুল: আরবী, ইংরেজী, জাপানী, ফরাসী, বাঙ্গালী, হিন্দী।

'আলি' প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণবাচক শব্দে 'ই' থাকবে।

ঠিক: চৈতালি, পুবালি, বর্ণালি, মিতালি, রুপালি, সোনালি।

ভুল: চৈতালী, পুবালী, বর্ণালী, মিতালী, রুপালী, সোনালী।

৫. কিছু শব্দে 'কি' ও 'কী' ব্যবহারের নিয়ম

অব্যয় ও সংযোগকারী শব্দে 'কি' হবে।

বিশেষণ বা সর্বনামে 'কী' হবে।

ঠিক:

কি (অব্যয়): তুমি কি যাবে?

কী (বিশেষণ/সর্বনাম): কী সুন্দর! এটা কী?

ভুল: তুমি কী যাবে? কী করবা কি?

৬. বিদেশি শব্দের বানান

বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের বানান বাংলার উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা হবে।

ঠিক: কাগজ, জমিন, জাদু, জাহাজ, হাসপাতাল।

ভুল: কাগজ্জ, জমীন, জাদু, জাহায, হসপিটাল।

কিছু ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত শব্দে 'য' ব্যবহৃত হবে।

ঠিক: আযান, ওযু, কাযা, নামায, রমযান, হযরত।

ভুল: আজান, ওজু, কাজা, নামাজ, রমজান, হজরত।

ইংরেজি শব্দের বাংলা উচ্চারণে তালব্য 'শ' ব্যবহৃত হবে।

ঠিক: টেলিভিশন, রেশন, স্টেশন, মিশন।

ভুল: টেলিভিষন, রেষন, ষ্টেশন, মিসন।

৭. সমাসবদ্ধ শব্দের বানান

সমাসবদ্ধ শব্দগুলো একসঙ্গে লেখা হবে।

ঠিক: আমন্ত্রণলিপি, জটিলতামূলক, সংবাদপত্র, পিতাপুত্র, ষোলোকলা।

ভুল: আমন্ত্রণ লিপি, জটিলতা মূলক, সংবাদ পত্র, পিতা পুত্র।

বিশেষ প্রয়োজনে হাইফেন (-) ব্যবহার করা যাবে।

ঠিক: কিছু-না-কিছু, না-শোনা কথা, মা-মেয়ে।

তবে কিছু ক্ষেত্রে সমাজবদ্ধ শব্দ আলাদাভাবেও লেখা যায়।

এই বানান রীতিগুলো অনুসরণ করলে বাংলা ভাষার শুদ্ধতা বজায় রাখা সহজ হবে। বানানের নিয়ম জানা থাকলে লেখার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং মনের ভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। সঠিক বানান, সুন্দর ভাষা!

অধিক অনুশীলনের জন্য পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্গত আরও কিছু বানান শুদ্ধিকরণ

অশুদ্ধ	*শুদ্ধ*	*অশুদ্ধ*	*শুদ্ধ*	*অশুদ্ধ*	*শুদ্ধ*
অন্তকরণ	*অন্তঃকরণ*	*ভুষন*	*ভূষণ*	*মুহুর্ত*	*মুহূর্ত*
অন্তপুর	*অন্তঃপুর*	*বিসন্ন*	*বিষণ্ণ*	*লক্ষন*	*লক্ষণ*
তপস্বি	*তপস্বী*	*ফেণা*	*ফেনা*	*ঘোসনা*	*ঘোষণা*
নিরিক্ষণ	*নিরীক্ষণ*	*নিশ্যেষ*	*নিঃশেষ*	*সল্পোন্নত*	*স্বল্পোন্নত*

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঈসত	ঈষৎ	কির্তী	কীর্তি	মিন	মীণ
গ্রীস্ম	গ্রীষ্ম	দিপ্ত	দীপ্ত	হিরা	হীরা
ব্রাম্য	ব্রাহ্ম	রজনি	রজনী	স্যামি	স্বামী
শোনিত	শোণিত	পরীত্রান	পরিত্রাণ	তৃন	তৃণ
সৌন্দর্জ্য	সৌন্দর্য	উন্ধ	ঊর্ধ্ব	লক্ষন	লক্ষণ
দর্পন	দর্পণ	প্রত্যখ্য	প্রত্যক্ষ	শৃংখল	শৃঙ্খল
গাং	গাঙ	মৃত্বিকা	মৃত্তিকা	খুধা	ক্ষুধা
সমর্পন	সমর্পণ	আহরন	আহরণ	অদৃস্য	অদৃশ্য
অধ্যত্বিক	আধ্যাত্মিক	ভাণ্ডার	ভান্ডার	প্রতিক্ষা	প্রতীক্ষা
পৃহা	স্পৃহা	প্রাচিন	প্রাচীন	দির্ঘায়ু	দীর্ঘায়ু
বাস্পীভুত	বাষ্পীভূত	তরা	ত্বরা	ব্রাহ্মন [ব. বো. ১৬; দি. বো. '১৫; কু. বো.'০১; চ. বো. '০৬; সি. বো. '১১]	ব্রাহ্মণ
শিক্ষনিয়	শিক্ষণীয়	স্বকিয়	স্বকীয়	শুন্য	শূন্য
অধিকারীনী	অধিকারিণী	উত্তির্ন	উত্তীর্ণ	প্রণয়ীনী	প্রণয়িনী
বর্ননা	বর্ণনা	অস্তিত্ত্ব	অস্তিত্ব	কর্ন	কর্ণ
গোড়া	গোঁড়া	শ্বেতপদ্য	শ্বেতপদ্ম	নিতিপরায়ন	নীতিপরায়ণ
সত্ত্ব	সত্য	আবিঃকার	আবিষ্কার	সন্মান	সম্মান
নৈপূণ্য	নৈপুণ্য	দিকনির্নিয়	দিগনিনয়	অনীর্বাচনিয়	অনির্বচনীয়
ত্বত্ত্ব	তত্ত্ব	বন্দীনি	বন্দিনি	প্রান	প্রাণ
অশ্বথ্য	অশ্বত্থ	ব্যাক্ত	ব্যক্ত	প্রতিক	প্রতীক
রসত্তোর্ণ	রসোত্তীর্ণ	অভিলাশ	অভিলাষ	কীর্তণ	কীর্তন
দুর্ভীক্ষ	দুর্ভিক্ষ	সজ্ঞা	সংজ্ঞা	পর্যবেক্ষন	পর্যবেক্ষণ
ভৌগলীক [য. বো. '১৪]	ভৌগোলিক	শির্ষ	শীর্ষ	বিল্মমঙ্গাল	বিল্বমঙ্গাল
ব্যয়াম	ব্যায়াম	মধ্যমনী	মধ্যমণি	শ্রিমতী	শ্রীমতি
বিশ্লেশন	বিশ্লেষণ	নিশিথীনি	নিশীথিনী	গৃহীনী	গৃহিণী
দরারোগ্য	দুরারোগ্য	ঝরণা	ঝরনা	সহচরি	সহচরী
ক্ষীন	ক্ষীণ	গোস্টি	গোষ্ঠী	মুনষত্ব	মনুষ্যত্ব
উদ্যেশ্য	উদ্দেশ্য	পরীগনিত	পরিগণিত	সাচ্ছন্দপূর্ণ	স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ
নিয়ন্ন	নিয়ন্ত্রণ	দারিদ্র্যতা	দরিদ্রতা	সংকির্ণতা	সংকীর্ণতা
দির্ঘশাস	দীর্ঘশ্বাস	স্পর্ষ্ঠ	স্পষ্ট	তারুন্য	তারুণ্য
রিতি	রীতি	রুপ	রূপ	জির্ন	জীর্ণ
নগিড়	নিগড়	ইক্ষণ	ঈক্ষণ	পিড়ীত	পীড়িত
অট্রহাসি	অট্টহাস্য	সমর্পন	সমর্পণ	ঝঞ্জা	ঝঞ্ঝা

অশুদ্ধ	*শুদ্ধ*	*অশুদ্ধ*	*শুদ্ধ*	*অশুদ্ধ*	*শুদ্ধ*
জ্যোতিস্ক	*জ্যোতিষ্ক*	*রশ্মী*	*রশ্মি*	*সিরোণাম*	*শিরোনাম*
দির্ঘ	*দীর্ঘ*	*কল্যানি*	*কল্যাণী*	*কৃর্তী*	*কীর্তি*
সমিরণ	*সমীরণ*	*পার্বন*	*পার্বণ*	*কল্যান*	*কল্যাণ*
মাহাত্ব	*মাহাত্ম্য*	*প্রাচিন*	*প্রাচীন*	*ভূগোলিক*	*ভৌগোলিক*
দ্রবিভুত	*দ্রবীভূত*	*শশুর*	*শ্বশুর*	*লিণ*	*লীন*
পরিমান	*পরিমাণ*	*আবীর*	*আবির*	*লোভি*	*লোভী*
পুজামন্ডপ	*পূজামণ্ডপ*	*গিতি*	*গীতি*	*চুড়া*	*চূড়া*
উনবিংষ	*উনবিংশ*	*উত্তরিয়*	*উত্তরীয়*	*মুর*	*মূঢ়*
শ্বাক্ষর	*স্বাক্ষর*	*বিরহীনি*	*বিরহিণী*	*স্বর্ন*	*স্বর্ণ*
মাধুরি	*মাধুরী*	*আত্বা*	*আত্মা*	*নিলাভ*	*নীলাভ*
পুন্যাহ	*পুণ্যাহ*	*জয়ধনি*	*জয়ধ্বনি*	*বিশ্য*	*বিশ্ব*
দিপাজ্জলা	*দীপোজ্জ্বলা*	*মধুছন্দা*	*মধুচ্ছন্দা*	*অরুন*	*অরুণ*
আর্টিষ্ট	*আর্টিস্ট*	*করুনা*	*করুণা*	*পরাশ্রয়ি*	*পরাশ্রয়ী*
নিরিক্ষন	*নিরীক্ষণ*	*মুর্ছিত*	*মূর্ছিতা*	*সামগ্রি*	*সামগ্রী*
শারিরীক [চ. বো. '১৭; য. বো. '০৭, '০৫; সি. বো. '১৪]	*শারীরিক*	*অংক*	*অঙ্ক*	*নির্বিক*	*নির্ভীক*
বিদ্যেশ	*বিদ্বেষ*	*নিরব*	*নীরব*	*লিলা*	*লীলা*
জ্যোতির্ব্যত্তা	*জ্যোতির্বেত্তা*	*মাধবি*	*মাধবী*	*সমুজ্জল*	*সমুজ্জ্বল*
অপরীসিম	*অপরিসীম*	*সন্ধা*	*সন্ধ্যা*	*ঘ্রান*	*ঘ্রাণ*
বিভৎস	*বীভৎস*	*প্রগাড়*	*প্রগাঢ়*	*দুঃখি*	*দুঃখী*
উপলব্ধী	*উপলব্ধি*	*ভয়ঙ্কর*	*ভয়ংকর*	*ভূশিত*	*ভূষিত*
পরিক্রমন	*পরিক্রমণ*	*অগ্রনি*	*অগ্রণী*	*কীরিট*	*কিরীট*
পাশান	*পাষাণ*	*অনির্বান*	*অনির্বাণ*	*তেজঃকার*	*তেজস্কর*
পুজারি	*পূজারি*	*মনীকুঞ্জ*	*মণিকুঞ্জ*	*ফনা*	*ফণা*
অগ্নিমন্দা	*অগ্নিমান্দ্য*	*স্বতউৎসারীত*	*স্বতঃউৎসারিত*	*আকাঙ্খা [রা. বো. '১৯]*	*আকাঙ্ক্ষা*
সৌন্দর্যত্বত্ত্ব	*সৌন্দর্যতত্ত্ব*	*সন্মুখ*	*সম্মুখ*	*সপ্তর্ষী*	*সপ্তর্ষি*
শির্ষক	*শীর্ষক*	*সংগি*	*সঙ্গী*	*জিবন্ত*	*জীবন্ত*
ভগিনি	*ভগিনী*	*পরজিবি*	*পরজীবী*	*কুমারি*	*কুমারী*
অনুগামীনি	*অনুগামিনী*	*স্তুপ*	*স্তূপ*	*লাবন্য*	*লাবণ্য*
অর্ধাঙ্গি	*অর্ধাঙ্গী*	*ব্যাথা*	*ব্যথা*	*সৃতি*	*স্মৃতি*
ধংস	*ধ্বংস*	*সমির*	*সমীর*	*অন্তর্লিন*	*অন্তর্লীন*
দাসত্ত্ব	*দাসত্ব*	*নিলাম্বরি*	*নীলাম্বরী*	*পন্য [চ. বো. '১৪]*	*পণ্য*
আত্তীয়তা	*আত্মীয়তা*	*এস্থ*	*ত্রস্ত*	*জমদুত*	*যমদূত*
অনভুতি	*অনুভূতি*	*তিব্র*	*তীব্র*	*স্বত্ত্ব-স্বামীত্ব*	*স্বত্ব-স্বামিত্ব*
রোদ্রকউজ্জল	*রৌদ্রকরোজ্জ্বল*	*ভিরু*	*ভীরু*	*দরুহ*	*দুরূহ*

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
জীর্নাবরন	জীর্ণাবরণ	পত্নি	পত্নী	পৃথ্যী	পৃথ্বী
ধ্যানি	ধ্যানী	নিমিত্ব	নিমিত্ত	অধির	অধীর
দ্বীধা	দ্বিধা	সংকীর্ন	সংকীর্ণ	কুহেলী	কুহেলি
বরেন্য	বরেণ্য	তিক্ষ্ম	তীক্ষ্ণ	কবরি	কবরী
পানিনি	পাণিনি	ত্বাত্ত্বিক	তাত্ত্বিক	স্বচ্ছলতা	সচ্ছলতা
ধর্মিয়	ধর্মীয়	আতংক	আতঙ্ক	মন্ত্রনা	মন্ত্রণা
প্রবিন	প্রবীণ	গবেষনা	গবেষণা	দর্বোধ	দুর্বোধ
বির	বীর	বন্টন	বণ্টন	সম্ভাষন	সম্ভাষণ
ভিষন	ভীষণ	প্রনয়ণ	প্রণয়ন	বহ্নি	বহ্ণি
পুর্ন	পূর্ণ	পরাধিন	পরাধীন	জলন্ত	জ্বলন্ত
অপুর্ব	অপূর্ব	অন্তর্জামি	অন্তর্যামী	শশ্মান	শ্মশান
জালা	জ্বালা	উচ্ছাস [য. বো '১৫; কু. বো., সি. বো. '০৯; রা. বো. '০৭]	উচ্ছ্বাস	সান্ত্রি	সান্ত্রী
বিশ্ময়	বিস্ময়	আত্তিয়	আত্মীয়	মহর্ষী	মহর্ষি
বল্কল	বল্কল	পল্লী	পল্লি	গৃহস্তালি	গৃহস্থালি
অতিত	অতীত	শুত	সুত	আসিষ	আশিস
স্বাক্ষ্য	সাক্ষ্য	খ্যান্ত	ক্ষান্ত	তরি	তরী
জ্যেতির্ময়	জ্যোতির্ময়	সিমান্ত	সীমান্ত	সন্যাসী [ঢা. বো. '১৫; য. বো. '১৭, '০৪, '০১; রা. বো. '১৪, '১২, '০৭; দি. বো. '১০; চ. বো. '০৬]	সন্ন্যাসী
প্রনালি	প্রণালি	মুর্তি	মূর্তি	মুহুর্ত	মুহূর্ত
বৈশিষ্ট	বৈশিষ্ট্য	আগমনি	আগমনী	খ্যতবিখ্যত	ক্ষতবিক্ষত
গন্ডী	গন্ডি	সূর্য্য	সূর্য	কনিকা	কণিকা
পন্ডীত	পন্ডিত	ষ্টিমার	স্টিমার	সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম	সুবর্ন	সুবর্ণ	সানিত	শাণিত
ভগ্নি	ভগিনী	প্রোজ্বলিত	প্রজ্বলিত	ধিরে	ধীরে